আনন্দবাজার পত্রিকা

নতুন বৈষম্যের প্রয়োজন নেই

সাবির আহমেদ

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

এই আকালেও ভারতীয় হিসেবে যে ক'টা বিষয়ে খানিক শ্লাঘা বোধ হয়, তার অন্যতম হল প্রাথমিক শিক্ষায় সব ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর শিশুরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আর্থিক কারণে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারত না।

শিক্ষার অধিকার আইন এই ক্ষেত্রে একটা নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে সরকারি ও সরকারপোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চান্ন লক্ষেরও বেশি শিশু পড়ে। এই শিশুরা কারা? ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের পরিসংখ্যান অনুসারে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি অবধি) পঞ্চান্ন লক্ষ ছাত্রের প্রায় ৮০ শতাংশই সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীভুক্ত। এর মধ্যে তফসিলি জাতি ও মুসলমান শিশু মিলিয়ে প্রায় ৬৫ শতাংশ। এ ছাড়া জনজাতি ও

অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি নিয়ে প্রায় ১৫ শতাংশ। এই ৮০ শতাংশ শিশুই শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে অবৈতনিক শিক্ষা, মিড-ডে মিল ছাড়াও বছরে প্রায় এগারোশো টাকার মতো বৃত্তি পায়। স্কুলে বেতন না লাগলেও লেখাপড়ার অন্যান্য খরচ কেমন, আমরা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে জানি। কাজেই, এই স্কলারশিপের গুরুত্ব অপরিসীম।

কিন্তু, যে ২০ শতাংশ ছেলেমেয়ে বৃত্তি পায় না, তারা কারা? গ্রামের স্কুলগুলোর দিকে তাকালে বৃত্তিপ্রাপ্তদের সঙ্গে তাদের ফারাক চোখে পড়বে না। কার্যত একই রকম দারিদ্রের চিহ্ন বয়ে

বেড়ায় তারা। এক ধরনের সামাজিক বঞ্চনার চিহ্ন মুছতে গিয়ে অন্য বঞ্চনার আখ্যান তৈরি হচ্ছে না তো এই স্কুলগুলোয়?

হুগলি জেলার হরিপাল ব্লকের মুসলমান অধ্যুষিত এক গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। গত দশ বছরে কী ভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় নানান সামাজিক গোষ্ঠীর শিশুদের অংশগ্রহণ বেড়েছে ও জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে, সেই আলোচনা। শিক্ষাক্ষেত্রে এই অগ্রগতির পিছনে সরকারি বৃত্তির কী ভূমিকা আছে, সে প্রশ্ন তুলতেই প্রায় জোর করে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে গেলেন। তার পর আমার দিকে একগুচ্ছ প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। সরকারের দেওয়া পোশাকে এক ধরনের সমতা প্রকাশ পাচ্ছে, তবে প্রায় সবার চোখেমুখেই অপুষ্টির সুস্পষ্ট ছবি। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত জনা কুড়ি ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন, ‘আজ কী খেয়ে স্কুলে এসেছিস?’ কয়েক জন খালিপেটে এসেছে। যারা খেয়ে এসেছে, তাদেরও নেহাত অপর্যাপ্ত খাবার জুটেছে।

কথায় কথায় মিড-ডে মিলের সময় হয়ে এল। ছাত্ররা অস্থির। ঘণ্টা বাজতেই তারা হাত ধুয়ে দেয় ছুট, এর পর একসঙ্গে পাত পেড়ে মিড-ডে মিল। সারিবদ্ধ ভাবে বসে গোগ্রাসে খেতে থাকা ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে প্রধান শিক্ষক বললেন, ‘আপনিই বলুন, একই ক্লাসের পাঁচ জন ছাত্রকে কী ভাবে বোঝাব যে তোরা সরকারি বৃত্তি পাবি না?’

অন্য এক স্কুলে সংখ্যালঘু, তফসিলি জাতি ও জনজাতীয়দের জন্য সরকারি বৃত্তির তালিকা তৈরির পদ্ধতি দেখে বেশ অবাকই হয়েছিলাম। শ্রেণিকক্ষে এসে শিক্ষক হাঁক দিলেন, 'মাইনরিটি বাচ্চা ক'টা আছিস, দাঁড়িয়ে পড়।' তাদের সংখ্যা গোনা হলে পরের হাঁক, 'এস-টি বাচ্চাগুলো দাঁড়া।' যে বাচ্চাগুলোকে দাঁড়াতে হল, তাদের মানসিক অবস্থা কী হল? আর, যারা দাঁড়ানোর ডাক পেল না, তারা নিজেদের বঞ্চিত মনে করল, বুকে পোঁতা হয়ে গেল বিদ্বেষের বীজ।

এই কথাগুলো বলার অর্থ এই নয় যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি প্রণোদনার দরকার নেই। বরং, এই জাতীয় সরকারি বৃত্তির কারণেই প্রাথমিক শিক্ষায় সব সামাজিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। কিন্তু একই রকম সামাজিক অবস্থানে থাকা শিশুদের ক্ষেত্রে কৃত্রিম ভাবে বৈষম্যমূলক পরিবেশ তৈরি করলে এক বিপুল সামাজিক ক্ষতির আশঙ্কা। বিভাজনের কর্কট ব্যাধি এখন রাজনীতির মূলধন। তাতে আরও আগুন দিয়ে কী লাভ? এই বৈষম্যের প্রয়োজনও নেই। এমনিতেই রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের মধ্যে আশি শতাংশই বছরে ১১০০ টাকার কাছাকাছি বৃত্তি পায়। এতে সরকারের খরচ বছরে প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা। অতিরিক্ত কুড়ি শতাংশের জন্য বাড়তি খরচ হবে মাত্র ১২০ কোটি টাকা। রাজ্য বাজেট বা শিক্ষা বাজেটের অনুপাতে এই টাকা যৎকিঞ্চিৎ। যদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচিকে সর্বজনীন প্রকল্প করে তোলা যায়, তবে এক ঢিলে অনেক পাখি মারা যাবে। এর সামাজিক মূল্য, এমনকি রাজনৈতিক সুবিধাও অনেক।

প্রতীচী ইনস্টিটিউট, কলকাতা